ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 02. No. 01. August 2009

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ:একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মো: গোলাম সারওয়ার* মো: মতিউর রহমান**

সারসংক্ষেপ: সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা এই বাংলায় সৃষ্টির আদিকাল থেকেই অনেক ভাষাভাষি ও বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের লোকজনদের আবির্ভাব ঘটেছে। ঠিক একইভাবে বহুপূর্বেই বৌদ্ধ ধর্মের আগমন ও ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বাংলার ভাবগাম্ভীর্য, রীতি-নীতি, শিক্ষা দীক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় তা তুলে ধরার পাশাপাশি নানান ধর্মের লোকজনদের মাঝে বৌদ্ধ ধর্ম তার কতটা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছে- উক্ত প্রবন্ধের সাহায্যে এগুলোর একটি আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। ঘটনার তাৎপর্য ও পরিধি ব্যাপক বিধায় অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুগে যুগে এই পৃথিবীতে বহু ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে মানবকূল। মানবতার মুক্তিই ধর্মের উদ্দেশ্য। গীতায় আছে "ধর্ম ধার্মিকং রক্ষতিঃ" অর্থাৎ ধমর্ই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে বহুবিধ সংগ্রাম, বিগ্রহ, হানাহানির ঘটনা ঘটেনি এমন দেশ পৃথিবীতে বিরল। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তারমধ্যে বিশ্ব ধর্ম হচ্ছে ৫টি। যথা : বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্ম এগুলোর মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই নাস্ড়িক ধর্ম।[১] আর আস্ড়িক নাস্ড়িক সকলের স্থান হিন্দু ধর্মে আছে। আর ইসলাম ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্ম আস্ড়িক ধর্মের মধ্যে পড়ে।

বিভিন্ন ধর্ম প্রচারক কর্তৃক ধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এমতে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ দেবের আবির্ভাবকাল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ তাব্দীতে।[২]

> Buddhism, like Jainism, is an offshoot of Hinduism. Although Buddhism denies the authority of the Vedas, there are obvious signs of the influence of the Vedas and the Upanishads on it. It hardly becomes able to divest itself of the essentials of the Hindu religions, ethical and cultural Traditions, at though it succeeds in presenting itself as a pure ethical and spiritual religions against the extreme polytheism and ritualism of the Vedic tradition.[3]

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তা বৌদ্ধ ধর্ম নামে পরিচিত।[৪] তাঁর সক্রিয় চিন্ড়ার বিবর্তন এই উপমহাদেশে একটানা এক সহস্র বছর ধরে চলেছে। উপমহাদেশের বাইরে সিংহল, শ্যাম, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, নেপাল, বিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, চীন এবং জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।[৫] মৌর্য যুগে বিহার এবং বাংলাদেশে এবং পালযুগে দীর্ঘকাল যাবৎ বৌদ্ধ দর্শন অনুশীলনের ফলে একটি স্বাধীন চিন্ড়ার বীজ উপ্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম মূল গ্রন্থ 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংঘের সমস্ড় নিয়মকানুন শৃঙ্খলা, তত্ত্বও আদর্শ এতে উলেণ্ঢখ পাওয়া যায়।[৬]

> "বঙ্গে এল বুদ্ধ বিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে
> নগর পুন্ড্রবর্দ্ধন ও নেই-স্বপ্ন হয়ে গেছে।
> নেই বালিকা উপাসিকা; আমার তারই হয়ে
> বরণ করি বুদ্ধ-বিভা, চিত্ত-প্রদীপ লয়ে;
> চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ বিভূতিরে
> নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে"
>
> - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
> কবিতা: বুদ্ধবরণ, কাব্য:
> *বেলাশেষের গান*

এশিয়ার আলোক-বর্তিকা গৌতম বুদ্ধ প্রাগ্রসর চৈতন্যের, মানবধর্মী দর্শনের এবং বিপণ্ঢবী ভাবধারার একটি তেজোদ্দীপ্ত এবং প্রবুদ্ধ ভাবমূর্তী। এই উপমহাদেশের প্রধানত পারজাগতিক চিন্ড়ার সর্বস্ব চিরায়ত সামাজকাঠামোর মধ্যে তিনি একটি স্বাধীন যুক্তি নির্ভর চিন্ড়ার ধারার প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধ ধর্ম এবং সমসায়িক জৈন ধর্ম, আজীবকসহ প্রভৃতি আন্দোলন মূলত: তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমির আত্মপ্রকাশ মাত্র। বৈদিক যুগের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে জটিলতা বৃদ্ধিপায় এবং সরল ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে বাহ্যিক আড়ম্বরতা বাড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে জনগণ ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের প্রতি বিরূপ হতে থাকে এবং প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন বিকাশের পথ প্রশস্থ হয়।[৭]

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী সরকারী সিটি কলেজ, রাজশাহী।
** এম. ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

[১] Kedar Nath Tiware, *Comparative Religion*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1992, P.45
[২] জগদীশ্বর সান্যাল, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৩।
[৩] Kedar Nath Tiware, Ibid, P.43.
[৪] অর্জুন বিকাশ চৌধুরী, *ভারতীয় দর্শন*, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ৯০
[৫] ড. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৪, পৃ. ৬৫।
[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬।

এসময় পূর্বভারতে গাঙ্গেয় সমভূমিতে কৃষি অর্থনীতির রূপান্ড়র ঘটে। এর মূলে ছিল নতুন কৃষি সরঞ্জাম ও গোসম্পদ। তাছাড়া লোহার আবিষ্কারের ফলে কৃষি ও শিল্পে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে পশুবলির প্রচলন বৃদ্ধি পেতে থাকলে গোসম্পদ অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পেতে থাকে যা কৃষি কার্যকে ব্যহত করে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে অহিংসা নীতির কথা বলা হয়েছিল যা গোসম্পদ রক্ষার সহায়ক হয়। কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে নতুন বণিক সম্প্রদায়ের আত্ম-প্রকাশ ঘটে যারা প্রভূত সম্পদের অধিকারী হলেও এদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। স্বভাবতই তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থক হয়েছিলেন।[৮]

বৈদিক যুগের শেষের দিকে সমাজ ব্যবস্থা অনমনীয় হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রাহ্মণদের পরে ছিল ক্ষত্রিয় ও এরপর বৈশ্যরা। এ সময় শূদ্রদের সম্পূর্ণ পৃথক জাতিতে পরিণত করা হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই কঠোর জাতিভেদ প্রথা ও আধিপত্য প্রতিবাদী ধর্মের আগমনের পথকে প্রশস্থ করে।[৯] তাছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ এমন একটি পথের নির্দেশ দেন যা মানুষকে দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত করতে পারে এবং মানুষ সহজ সরল জীবন যাপন করতে পারে। তাঁর প্রচারিত মতবাদ ছিল আচার অনুষ্ঠান পীড়িত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বির"দ্ধে এবং অন্যদিকে ছিল ভোগ, সুখ ও কৃচ্ছ সাধন সংক্রান্ড় চরম মতবাদের বির"দ্ধে। বৈষয়িক ও মানসিক পটভূমি থেকে উদ্ভূত এই আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনের বিবর্তনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১০]

গৌতম বুদ্ধ ৫৬৩ খ্রি.পূ. হিমালয়ের পাদদেশে লুম্বিনী গ্রামে কপিলবস্তুর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শাক্য জাতির নায়ক শুদ্ধোধন ছিলেন তাঁর পিতা এবং মাতা হলেন মায়াদেবী। বুদ্ধের পিতৃদত্ত নাম সিদ্ধার্থ, গোত্রগত নাম গৌতম এবং কুলগত নাম শাক্য সিংহ।[১১] সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরেই মাতার মৃত্যু হলে তিনি বিমাতা ও মাতৃস্বসা প্রজাপতি গৌতমীর দ্বারা লালিত পালিত হন। ষোল বছর বয়সে যশোধারা নাম্মী নামক রাজকুমারীর সাথে তাঁর বিবাহ হয় কিন্তু সংসারের ভোগ বিলাসে তিনি ছিলেন উদাসীন। জীবনের দুঃখ-কষ্ট তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবণের জন্য তিনি ২৯ বছর বয়সে সংসার, স্ত্রী-পুত্র, রাজপ্রসাদ সবকিছু ত্যাগ করে সন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন এবং ছয় বছর কঠোর সাধনার পর চরমসত্য বোধি লাভ করে বুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হন।[১২] এরপর তিনি দীর্ঘ ৪৫ বছর বিরামহীন ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার শীল[১৩], সমাধি[১৪]

[৮] কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, (কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ৭৮।

[৯] অতুল চন্দ্ররায়, ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস*, (কলিকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ২০০০), পৃ. ৫৮।

[১০] S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 1, (London: George Allem & Unwin Ltd. 1923), P. 342.

[১১] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[১২] জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০১) পৃ. ৪-৫।

[১৩] বৌদ্ধ পরিভাষায় সৎ বাক্য, সৎ কর্ম ও সৎ জীবিকাকে শীল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ও প্রজ্ঞার[১৫] বাণী প্রচার করেন। তিনি বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দুঃখের উৎপত্তি ও কারণ সম্পর্কে চারটি মহান সত্যের বিশেণ্ডষণ করেছেন যা আর্যসত্য নামে অভিহিত। তা হলো: (১) পৃথিবী ব্যাপী জীবন দুঃখের শৃংখলে বাধা, (২) দুঃখের কারণ তৃষ্ণা বা আকাঙ্খা, (৩) এই দুঃখের নিরোধ সম্ভব ও (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। দুঃখ নিরোধের পথ হিসেবে তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ তথা পথের নির্দেশ দেন। যথা- সৎ সংকল্প, সৎ চিন্ড়া, সৎ বাক্য, সৎ ব্যবহার, সৎ জীবন-যাপন, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি। বুদ্ধ তাঁর তত্ত্বকে যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করেন এবং ভক্তি মার্গের পথ ত্যাগ করে সবাইকে আদর্শ আট নীতির প্রেক্ষিতে পরিচালিত করার পথ তুলে ধরেছেন। তিনি বেদের অভ্রান্ড়তা, ধর্মের অলৌকিকতা, ঈশ্বরবাদ বা বস্তুর শাশ্বত সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। জাত-পাত, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসের উর্দ্ধে উঠে বুদ্ধের নৈর্বানিক ধর্ম গ্রহণ করার যুগোপযোগী আহ্বান সকল স্ড়রের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল।[১৬] গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে অর্থাৎ খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে বাংলায় পালযুগের অবসান পর্যন্ড় প্রায় দেড় হাজার বছর বৌদ্ধ ধর্ম উপমহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাক-গুপ্ত পর্বেই বৌদ্ধ ধর্মের বিস্ড়ার ঘটে। যদিও '*বোধিসত্ত্বাবধান কল্পলতা*' গ্রন্থে ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণীতে বুদ্ধের বাংলায় ধর্মপ্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছে কিন্তু এর পেছনে ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায়নি।[১৭] তবে '*বিনয়পিটকে*' বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দীক্ষাদান প্রসঙ্গে পুণ্ড্রের উলেণ্ডখ রয়েছে তা থেকে ধারণা করা যায় যে অশোকের পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম বাংলার কোন কোন জায়গায় প্রচারিত হয়েছিল। আশোকের রাজত্বকালে উত্তর বাংলা সরাসরি তাঁর সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। ইউয়েন সাঙ্ এর বিবরণী ও '*দিব্যবদান*' গ্রন্থ হতে বাংলায় আশোকের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে জানা যায়।[১৮] এছাড়া ফা-হিয়েন, ইৎসিং, শেংচি প্রমূখ চীনা পর্যটকদের বিবরণী হতে এসময় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রি:পূ: দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহাস্থান শিলালিপি হতে তা প্রমাণিত হয়।[১৯]
গুপ্ত শাসনামলে রাজাদের উদার আনুকূল্যে বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ্ এর বিবরণী হতে জানা যায় যে মহারাজ শ্রী গুপ্ত চীন দেশীয় ভিক্ষুদের জন্য নালন্দা থেকে চলিণ্ডশ যোজন পূর্বে মৃগস্থাপন স্তুপের কাছে একটি চীনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং

[১৪] বৌদ্ধ পরিভাষায় সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সৎ সমাধিকে একত্রে সমাধি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[১৫] বৌদ্ধ পরিভাষায়, সৎ দৃষ্টিও সৎ সংকল্পকে একত্রে প্রজ্ঞা বলা হয়েছে।

[১৬] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত; *ভারতীয় দর্শন*, প্রথমখ" (কলিকাতা : ব্যাণাজী পাবলিশার্স, ১৯৮৬), পৃ. ১২২-১৩০।

[১৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং; ১৪১১), পৃ. ৪৯৪।

[১৮] R.C Majumdar (ed), *History of Bengal* Vol.I, Dacca University, 2006, Pp.411-12.

[১৯] Dinesh Chandra Sircar (ed), *Select Inseriptions Bearing on Indian History and Civilization*, (Calcutta: Calcutta University, 1942), Pp. 82-83.

ভিক্ষুদের ভরণপোষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করেন। এই স্তূপ উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। গুপ্ত যুগে বাংলায় বৌদ্ধ সম্প্রসারণের প্রমাণ সেই সময়কালের কিছু মূর্তি ও তাম্রশাসন সমূহ হতে পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাংলায় আসেন। তিনি লিখেছেন যে, তখন তাম্রলিপ্তি নগরীতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। তিনি এখানে দুই বছর অবস্থান করে বৌদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং বৌদ্ধ মূর্তির ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর বিস্তৃত বর্ণনায় তাম্রলিপ্তির বিশাল বৌদ্ধ সংঘের একটি উজ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে।[২০]

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ্ এসময় বাংলার সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের যে বর্ণনা দিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণ সেকথার অসারতা প্রমাণ করে। হিউয়েন সাঙ্ এর বিবরণী সাক্ষ্যে জানা যায় যে, এসময় বাংলার কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে ৭০ টির ও বেশি সংঘারাম ও বৌদ্ধ স্তুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় ৮০০০ ভিক্ষু বাস করতেন।[২১] এ সময়কালে বাংলার দু'জন বিখ্যাত পন্ডিত ও মনীষী হলেন, বৌদ্ধাচার্য পন্ডিত শীলভদ্র ও বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী।

শশাঙ্কের পরবর্তীকালীন একশত বছর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ। এই সময় বহিঃশত্রুর আক্রমন, দেশব্যাপী বিশৃংখলা, স্থানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব ক্ষমতার লড়াই ও পারস্পরিক হানাহানি, সবল কতৃক দূর্বলের উৎপীড়ন প্রভৃতির ফলে দেশের অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিধ্বস্ড় হয়ে পড়ে। ইতিহাসের সর্বগ্রাসী এই নৈরাজ্যের সময়কাল '*মাৎস্যন্যায়*'[২২] নামে অভিহিত হয়েছে। মাৎস্যন্যায়ের এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে গোপাল প্রকৃতিগণের সহায়তায় বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এখান থেকেই পাল বংশের সূত্রপাত ঘটে। পালরাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পালবংশ চারশত বছর বাংলা শাসন করে। একই রাজবংশের এতো দীর্ঘকালের শাসন ইতিহাসে বিরল। এই দীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে চড়াই-উৎরাই লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু বিপর্যয়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে পাল রাজারা তাঁদের শাসন অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এই দীর্ঘ শাসনে বাংলার কৃতিত্ব অবশ্যই পালযুগের গৌরব। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা, প্রজাবৎসল শাসন নীতি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বিভিন্ন শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন এবং সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা এসবই পালযুগের কৃতিত্ব ও গৌরব।

[২০] নীহারঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০২।

[২১] প্রেমময় দাশগুপ্ত (সংকলিত), *হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত*, (কলিকাতা : ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ১৪৫-১৫১।

[২২] দেখুন, দর্শপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের চতুর্থ শেণ্যাক, তথ্যসূত্র : অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (সম্পা.), *গৌড় লেখমালা*, রাজশাহী, ১৩১৯, পৃ. ১৯। কৌটিল্য 'মাৎস্যন্যায়কে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : বড় বড় মৎস্য যেমন ছোট ছোট মৎস্যগুলোকে গ্রাস করে ফেলে তেমন তখন সবল লোকেরা দুর্বল ও অবল লোকদেরকে গ্রাস করে ফেলে। তথ্যসূত্র : রাধাগোবিন্দ বসাক (অনূদিত) *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, (কলিকাতা : জেনারেল-প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ১১।

প্রাচীন বাংলায় বাঙালির বহুমুখী সৃষ্টিশীলতার এই সময়ে ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বৌদ্ধধর্ম বাংলার সীমানা পেরিয়ে তিব্বত, জাভা, সুমাত্রা, মালেশিয়াতে বিস্ড়ার লাভ করে। বাংলার বৌদ্ধ পন্ডিতগণ ঐসবদেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখেন।

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সাধনার কেন্দ্র হিসেবে এসময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো পাল সম্রাট ধর্মপালের সময়ে নির্মিত পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বিহার। এছাড়া বিক্রমশীল বিহার, ওদন্ড়পূর বিহার, ত্রৈকুটক বিহার, দেবিকোট বিহার, ফুলণ্ঢবাড়ি বিহার ও জগদ্দল বিহার প্রভৃতি উলেণ্ঢখযোগ্য। এসমস্ড় বিহারগুলি দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ সময়ের বিখ্যাত পান্ডিতদের মধ্যে উলেখযোগ্য হলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, তিনি সিংহল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তিনি ১৭৫ টি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ দর্শনের এক নতুন মানবতাবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া শান্ড়িপাদ, সরোরুহবজ্র, কুক্কুরীপাদ, শবরীপাদ, কুমারচন্দ্র, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকরগুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, রত্নাকরশান্ড়ি, কুমার বজ্র, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভাদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা, লুই পা প্রমূখ পান্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্মের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।[২৩]

প্রাচীনকালে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের পটভূমি ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, বুদ্ধের প্রচারিত মূলতত্ব ও দর্শন বাংলার মাটিতে এসে সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। হিউয়েন সাঙ্ এর ভ্রমণকালীন সময় পর্যন্ড় বাংলায় হীনযান[২৪] বা থেরবাদের প্রাবল্য ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে পাল শাসনামলে মহাযান[২৫] মতবাদ প্রধান্য লাভ করে। বাংলায় বুদ্ধিবাদী বৌদ্ধ ধর্ম রূপান্ড়র পক্রিয়ায় মহাযান ক্রমান্বয়ে মন্ত্রযান[২৬], বজ্রযান[২৭], সহজযান[২৮],

[২৩] আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২), পৃ. ১১২-১১৩।

[২৪] রমেশচন্দ্র মুজমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টাস এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ২০৯-২১১।

[২৫] গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েন। প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল অংশটি স্থবিরবাদী বা থেরবাদী নামে পরিচিত হন আর বিরুদ্ধবাদীরা পরিচিত হন মহাসাংঘিক হিসেবে। স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদের হীনযান নামে আখ্যায়িত করা হয়, আর মহাসাংঘিকরা আখ্যায়িত হন মহাযান সম্প্রদায় হিসেবে। হীনযান মতে প্রত্যেক জীব তার নিজের নির্বানের জন্য সাধনা করবে। হীনযানের অনুসারীরা ত্রিপিটকে বর্ণিত নীতি শৃংখলার মধ্যে থাকতে চান এবং হীনযানের সমস্ড় শাস্ত্র পালি ভাষায় রচিত।

[২৬] বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে বিরুদ্ধবাদীরা মহাসাংঘিক নামে পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাসাংঘিক সম্প্রদায় পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হন। মহাযান মতে প্রত্যেক সমস্ড় জীবের মুক্তির জন্য সাধনা করবে। বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপের চেষ্টা মহাযান মতবাদে লক্ষণীয়। মহাযানের অধিকাংশ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

কালচক্রযান[২৯] প্রভৃতি তান্ত্রিক[৩০] মতবাদে রূপ লাভ করে এবং মানবতাবাদকে ধারণ করে লোকায়ত বাংলার মানুষের হৃদয়কে জয় করে। তাছাড়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাক্ত ধর্মের সমন্বয়ে আরও যে সমস্ড় রূপান্ড়র ঘটে তার মধ্যে অন্যতম হলো কৌলধর্ম[৩১], নাথধর্ম[৩২] ও অবধূতমার্গ।[৩৩] তান্ত্রিক সহজযানের পথ ধরে উদ্ভূত হলো সহজিয়া ধর্ম এবং এরই ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত হলো বাউল মার্গ।[৩৪] এভাবে প্রাচীন কাল হতে মুসলিম শাসনামল পর্যন্ড় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, প্রধান্য ও রূপান্ড়র সংঘটিত হতে থাকে।

উপমহাদেশে যখন বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয় ঘটতে থাকে সে সময় বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলকে সারা পৃথিবীর বৌদ্ধ অনুরাগীদের পীঠস্থানে পরিণত করে। শুধু পাল শাসকেরাই নয় সমসাময়িক কালে দক্ষিণপূর্ব বাংলার খড়্গ বংশ, দেব বংশ ও চন্দ্র বংশ প্রমূখ শাসকেরা ও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং এর পৃষ্ঠপোষক। এই অঞ্চলের লালমাই ময়নামতি প্রভৃতি এলাকা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ এবং বৌদ্ধ শাসকদের শাসনকাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একটি স্বর্ণজ্বল অধ্যায়। যদিও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন ও বর্মণ আধিপত্য, মুসলিম আক্রমণ ও বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক রূপান্ড়র বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। তথাপি প্রাচীন কাল থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ড় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিশিষ্টতার দাবী রাখে। প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ রয়েছে।[৩৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ড় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বজায় রেখেছেন। তাঁরা সাহিত্য, সাংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষায়, যথেষ্ট অবদান রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে নাস্ড়িকের আভাস থাকলেও তারা ছিলেন প্রকৃত মানবতাবাদী। একথায় ধর্মের মধ্যে যে শান্ড়ির ঘ্রাণ পাওয়া যায় তা পুরোপুরি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে। তাদের অতীত ইতিহাস ইতিহ্য ও দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে তাদেরকে মানবপূজারী ধর্ম নামে আখ্যায়িত করা যায়। বর্তমান বিশ্বে যে মানবতাবাদের সংকট চলছে এই সংকট উত্তরনে বৌদ্ধ ধর্মের উৎকর্ষতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

---

[২৭] বাংলায় মহাযানের বিরর্তনের প্রথম স্ড়র হলো মন্ত্রযান। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মন্ত্রকে মূল প্রেরণা করে ধারণী ও বীজের সমন্বয়ে মহাযানের নতুন ধ্যান ধারণা গড়ে তুললেন যা মন্ত্রযান নামে পরিচিত হয়।

[২৮] তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বিবর্তনে দ্বিতীয় স্ড়র হলো বজ্রযান। এতে মন্ত্র, মুদ্রা, ম-ল এর সাথে নানা প্রকার দেব-দেবীর পূজা, ধ্যান-ধারণা ও অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়া বিধি এবং কতকগুলো গোপন সাধন ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়।

[২৯] বজ্রযান সাধনার সূক্ষ্মতর স্ড়র হলো সহজযান। মন্ত্র, পূজা, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বজ্রযানের সাধন পথ আকীর্ণ। আর সহজযানে কোন দেব- দেবী, মন্ত্র, পূজা আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি নাই। সহাযানের অনুসারীদের কাছে বাহ্য অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বোধি বা বুদ্ধ আছেন এবং কেবল সহজ সাধনায় তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেই মোক্ষ লাভ করা যায়।

[৩০] বজ্রযানের একটি বিবর্তিত রূপ হলো কালচক্রযান। কালচক্রযানের অনুসারীদের মতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। এই কালচক্র সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ। কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ড় করা অর্থাৎ নিজেদের সেই কাল প্রভাবের উর্ধ্বে উন্নীত করা কালচক্রযানের অনুসারীদের উদ্দেশ্য। তাঁদের বিশ্বাস মতে, যোগ সাধনার বলে দেহাভ্যন্ড়রস্থ নাড়ী ও নাড়ী কেন্দ্রগুলোকে আয়ত্ত করে প্রাণ, অপ্রাণ, সমান, উদান ও ব্যান শরীর অভ্যন্ড়রের এই পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করতে পারলেই প্রাণক্রিয়া নির-দ্ধ করা যায় এবং তাতেই কাল নিরস্ড় হয়।

[৩১] তন্ত্র বলতে বোঝায় শক্তির সাধনা। পরম নির্বাণ লাভের জন্য বৌদ্ধ সাধন পন্থায় তন্ত্র কালক্রমে প্রভাব বিস্ড়র করে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে পারলেই আধ্যাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়, এই ধারণা তান্ত্রিক সাধকদের স্থির বিশ্বাস।
তথ্যসূত্র : পরিতোষ দাস, সহজিয়াও গৌড়ীয় বেষ্ণব ধর্ম, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩০।

[৩২] তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ে শাক্ত ধর্মের যেসব নতুন রূপ দেখা দেয় কৌলধর্ম এর মধ্যে অন্যতম। কৌলধর্ম বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনবাদ থেকে উৎপন্ন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। তথ্যসূত্রঃ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৯, পৃ. ৫৭।
তথ্যসূত্র : জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[৩৩] নাথ ধর্ম তান্ত্রিক শৈবধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। নাথ ধর্মের অনুসারীরা সহযানের মতো বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করেন। নাথ ধর্মে মূর্তি পূজার স্থান নেই। তথ্যসূত্রঃ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

[৩৪] অবধূতগণ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের যোগসাধনা অনুসরণ করতেন। তাঁরা কঠোর সন্ত্রাস জীবন যাপন করতেন। তাঁরা বর্ণাশ্রম স্বীকার করতেন এবং শাস্ত্র পাঠ ও তীর্থ ভ্রমণ মানতেন না। তথ্যসূত্রঃ জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

[৩৫] সহজিয়া মতবাদ হতে বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব। সহজ সুখ বা মহাসুখ তাঁদের লক্ষ্য। বাউলগণ বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন না। তাঁদের গীতিকায় বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান আছে।